জানুয়ারী - মার্চ ২০১৬

ISSN 2222-5188

৫ম পর্ব, ১ম সংখ্যা

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

ডায়াবেটিক ফুট

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ	৩
চমকপ্রদ তথ্য	৬
জনস্বাস্থ্য	৭
প্রশ্ন-উত্তর	১০
চিকিৎসা	১১
ইনফো কুইজ	১৪
স্বাস্থ্যকথা	১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইব্রাহীম রহমান
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

প্রথমেই আপনাদের সবাইকে জানাই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

প্রতি বছর বাংলাদেশে ব্যাপক হারে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ডায়াবেটিসকে বলা হয় সাইলেন্ট কিলার। কেননা এ রোগ থেকে কিডনি, চোখ, হার্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হতে পারে পায়ের সমস্যাও। পায়ের এই সমস্যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে ডায়াবেটিক ফুট। সঠিক সময়ে এই রোগ নির্ণয় না হলে পায়ে পচন হতে পারে। তাই এই সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধে 'ডায়াবেটিক ফুট' কি, কিভাবে হয়, প্রতিকার, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এবারের 'চমকপ্রদ তথ্য' বিভাগটিতে মানুষের মাথা প্রতিস্থাপন, নির্ঘুম শিশুরা বেশি দুষ্টু এবং অন্ধকে দৃষ্টি দেবে কান সম্পর্কে তিনটি মজার তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফরমালিন শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু দোকানিরা পচনরোধে সবকিছুতে ফরমালিন ব্যবহার করে। বাজারের এমন কোন জিনিস নাই যেখানে ফরমালিন মিশানো হয় না। ফরমালিনযুক্ত খাবার খেয়ে আমাদের দেশের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছি নানাবিধ অসুখের দিকে। ফরমালিনের ক্ষতিকর দিক এবং তার থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবারের 'জনস্বাস্থ্য' বিভাগটিতে। এছাড়াও মুখের ছত্রাক এবং শীতে পা ফাটার কারণ ও প্রতিকার নিয়েও কার্যকারী কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, সবাই এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে এ রোগ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। প্রজননক্ষম বয়সে নারীদের সবচেয়ে বেশি যে টিউমারটি হয় তা হলো জরায়ুর টিউমার। এটি কোনো জীবনঘাতী ব্যাধি না হলেও টিউমারের কারণে গর্ভধারণ অবস্থায় মায়েরা বিভিন্ন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সংখ্যার 'চিকিৎসা' বিভাগটিতে কালাজ্বর এবং জরায়ুর টিউমার এই দুটি রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাসহ বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

'স্বাস্থ্যকথা' বিভাগটিতে আগুনে পুড়ে গেলে তাৎক্ষনিক চিকিৎসার সহজ এবং কার্যকারী উপায় সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে।

সর্বশেষে, এ সি আই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

ডায়াবেটিক ফুট

আমাদের শরীরের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হল পা। পা ছাড়া আমরা অচল। এজন্য সব সময় আমাদের পায়ের যত্ন নিতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীর পায়ের আরও বেশী যত্ন নেয়া প্রয়োজন। কেন, কিভাবে পায়ের যত্ন নিতে হবে সেটা জানা খুবই প্রয়োজনীয়। সাধারণত, ১০ বছর বা তার চেয়ে বেশী সময় যাবত ডায়াবেটিস থাকলে রোগীর কিছু জটিলতা (Complication) দেখা দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে আরও কম সময়েও জটিলতা দেখা দিতে পারে। ১৫% ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে এই জটিলতা দেখা দিতে পারে। পৃথিবীতে যত রোগীর পা কাটা হয় তার মধ্যে ৮৪% হল ডায়াবেটিক পা। ডায়াবেটিক জটিলতা দুই ধরনেরঃ (১) ক্ষুদ্রতর রক্তনালীর জটিলতা (Micro Vascular Complication) (২) বৃহত্তর রক্তনালীর জটিলতা (Macro Vascular Complication)।

ক্ষুদ্রতর রক্তনালীর জটিলতাঃ যেমন ডায়াবেটিস জনিত চোখের রোগ (ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি), ডায়াবেটিস জনিত কিডনির রোগ (ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি), ডায়াবেটিস জনিত স্নায়ু রোগ (ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি)।

বৃহত্তর রক্তনালীর জটিলতাঃ যেমন হৃদরোগ (করোনারী আর্টারী ডিজিজ), মস্তিস্কের রক্তনালীর রোগ (সেরেব্রোভাস্কুলার ডিজিজ), দূরবর্তি রক্তনালীর রোগ (পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ যেমনঃ হাত পায়ের রক্তনালীর রোগ)।

ডায়াবেটিক ফুট কিভাবে হয়

ডায়াবেটিক ফুট একটি ডায়াবেটিস মেলাইটাস জনিত পায়ের বৃহত্তর রক্তনালীর জটিলতা। ডায়াবেটিস রোগীর পায়ে আঘাত লাগলে বা ক্ষত হলে সেখানে ক্ষুদ্র রক্তনালীর বিকাশ, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স ও চামড়া ইত্যাদির বৃদ্ধি খুব ধীর গতিতে হয়। ফলে ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয় এবং ক্ষত শুকাতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এতে জীবাণু সংক্রমনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে দুর্গন্ধযুক্ত পচন (Gangreen) হতে পারে। রোগীর জীবন রক্ষার্থে অনেক সময় পা কেটে বাদ দিতে হয়। সাধারণ নিয়মে, হৃদপিন্ড থেকে যে অঙ্গের দূরত্ব যত বেশী, সে অঙ্গের ক্ষত শুকনোর গতি তত কম। এছাড়াও, শরীরের যে সব স্থানে চামড়ার ঠিক নীচেই হাড় থাকে, সেখানে চামড়ার ক্ষত শুকানোর গতিও কম। তাই হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা ও আঙ্গুলের ক্ষত ধীর গতিতে শুকায়। আর ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে তা শুকানোর গতি আরো ধীর।

ঝুঁকির কারণ

ডায়াবেটিস রোগীর পায়ে ক্ষত তৈরিতে প্রধান কারণগুলো হল ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথী, কম রক্তচলাচল ও জীবাণু সংক্রমনের সম্ভাবনা। ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথী হল পায়ে ব্যথার অনুভুতি কমে যাওয়া। এর ফলে রোগী আঘাত পেলেও ব্যথা অনুভব করেন না, ফলে পা কেটে গেলে বা পায়ে ফোস্কা পড়লেও রোগী তা বুঝতে পারেন না। সাধারনত পায়ের পাতা, পায়ের আঙ্গুল, গোড়ালি ও পায়ের আঙ্গুলের জোড়া (মেটা টারসো ফ্যালানজিয়াল জয়েন্টে) ক্ষত সৃষ্টি হয়। ডায়াবেটিস রোগীর পায়ের রক্তনালীতে চর্বি জাতীয় বা রক্তের অন্যান্য জমাট ময়লা (এথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক) জমে রক্তনালীর ভিতরটা সংকুচিত হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলে ক্ষতস্থানে পুষ্টি ও রক্তের জীবাণুরোধক উপাদানগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছাতে পারে না। অবশেষে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, যেখান থেকে পায়ে পচন দেখা দিতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ন পা

নীচের এক বা একাধিক কারণ থাকলে তাকে ঝুঁকিপূর্ন পা হিসেবে গণ্য করতে হবে। সাধারনত ঝুঁকিপূর্ন পায়েই ডায়াবেটিস জনিত জটিলতা দেখা দেয়।

- পায়ে পূর্বের কোনো ক্ষত বা পায়ের কোনো অংশের অঙ্গচ্ছেদ থাকলে

- মোটা নখ, পায়ের হাড়ের জোড়ার সীমিত নড়াচড়া, হাড়ের অঙ্গ বিকৃতি থাকলে
- পায়ে জীবাণুর সংক্রমন বা অন্যান্য সমস্যা যেমনঃ লাল চাকা, গরম হওয়া, কড়া পড়া বা কড়ার নীচে রক্ত জমাট বাঁধা থাকলে
- পায়ের বিভিন্ন রক্তনালীর ধমনীর গতি বা পালস না পাওয়া গেলে
- পায়ের স্পর্শ অনুভুতি না থাকলে
- পায়ের তাপ অনুভুতি না থাকলে
- পায়ের কম্পন অনুভুতি না থাকলে

এছাড়াও পায়ের অঙ্গবিকৃতির কারনেও পা ঝুকিপূর্ণ হয়। যেমনঃ পায়ের কোন আঙ্গুলের সামনের অংশ নীচের দিকে বেঁকে থাকা (Claw toes), পায়ের আঙ্গুলের গোঁড়ার পিছনের হাড় উঁচু হয়ে থাকা, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল ২য় আঙ্গুলের দিকে বেঁকে থাকা (Bunion), পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের গোঁড়া ফুলে লাল হয়ে থাকা (Bunionnette), পায়ের ছোট ছোট ওজনবাহী হাড়ের ক্ষয় জনিত পদ বিকৃতি (Charcot joint) ইত্যাদি।

ডায়াবেটিক ফুটের ওয়াগনারের শ্রেনীবিভাগ (Wagner's Grading of Diabetic Foot Lesion)

ওয়াগনারের শ্রেণীবিভাগ (০-৫) অনুযায়ী ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের ক্ষত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা হয়।

- গ্রেড ০ = নিখুঁত চামড়া, কোনো ক্ষত নেই তবে ঝুঁকিপূর্ন পা
- গ্রেড ১ = চামড়া বা চামড়ার নীচের টিস্যুর ক্ষত
- গ্রেড ২ = গভীর ক্ষত কিন্তু হাড় অনাক্রান্ত, কোনো ফোঁড়া বা পুঁজ হয়নি
- গ্রেড ৩ = অস্থির প্রদাহ সঙ্গে গভীর ক্ষত, বা ফোড়া বা পুঁজ হয়েছে
- গ্রেড ৪ = পচা ঘা (পায়ের আঙ্গুল ও পায়ের সামনের অংশ)
- গ্রেড ৫ = পচা ঘা (সম্পূর্ণ পা)

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যমাত্রা

সকালের নাস্তার আগে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ৬.১ মিলিমোল/লিটার (১১০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার) এর নীচে, খাওয়ার পরে ৮ মিলিমোল/লিটার (১৪৫ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার) এর নীচে রাখতে হবে। HbA1c ৭% এর নীচে থাকতে হবে। LDL কোলেস্টেরল ১০০ এর নীচে, HDL কোলেস্টেরল ৪০ এর উপরে, Triglyceride (TG) ১৫০ এর নীচে, Blood Pressure (BP) ১৩০/৮০ এর নীচে থাকতে হবে। BMI (Body Mass Index) ২৫ কেজি/বর্গমিটার এর নীচে থাকতে হবে।

BMI মাপার পদ্ধতি হলঃ ওজন (কেজি) ÷ উচ্চতা (মিটার) X উচ্চতা (মিটার)।

মেডিকেল চিকিৎসা

- কোনো সংক্রমণ ছাড়া পায়ের ছোটখাটো ক্ষত থাকলে এন্টিসেপটিক সলিউশন ও নিয়মিত ড্রেসিং করতে হবে
- প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক ঔষধ, জীবাণু মুক্ত গজ ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্ষতস্থানের পরিচর্যা ও মৃত টিস্যু কেটে ফেলে দিতে হবে, পায়ের ক্ষত বেশী খারাপ হলে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট অংশ কেটে বাদ দিতে হবে
- প্রয়োজন হলে (ভাস্কুলার সার্জারী) পায়ের রক্ত নালীর অপারেশন করাতে হবে

উপদেশ

- পায়ের উপর থেকে যে কোনো ধরণের চাপ কমাতে হবে
- একই সাথে ডায়াবেটিস পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- ওজন কমাতে হবে
- ডায়াবেটিক পায়ের চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত ইনসুলিন নিলে ক্ষত সাধারনত দ্রুত শুকায়

ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের যত্ন

- অতিরিক্ত গরম পানি দিয়ে গোসল করা উচিৎ না, এতে পায়ের পাতা বা কোনো অংশ পুড়ে গেলে বা ফোস্কা পড়লেও পায়ের অনুভূতি কম থাকার কারণে বোঝা যায় না। তাই গরম পানি ব্যবহার করার সময় নিজে না দেখে ডায়াবেটিস নেই এমন কাউকে দিয়ে দেখাতে হবে পানি বেশী গরম কিনা

- হিটার বা আগুনের খুব কাছে বসা উচিৎ না, এতে অজান্তে পা পুড়ে যেতে পারে
- পায়ে বেশী গরম পানির সেক দেয়া উচিৎ না, এতে ফোস্কা পড়তে পারে
- ঘুমানোর সময় বিছানায় গরম পানির বোতল, বৈদ্যুতিক কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার না করা উচিৎ
- পায়ে যে কোনো ধরনের আঘাতের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলা। যে সব খেলাধুলায় পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে, সে সব খেলাধুলা পরিহার করতে হবে। এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা দিয়ে না হেঁটে ভালো রাস্তা দিয়ে চলাচল করার চেষ্টা করতে হবে। ভিড়ের মধ্যে হাঁটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে পায়ের উপর অন্য কারো পায়ের পাড়া না পড়ে
- ঘরে সবসময় কাপড়ের জুতা বা নরম রাবারের জুতা পরতে হবে
- বাইরে বের হলে অবশ্যই জুতা পরতে হবে। জুতা পরার সময় জুতার ভিতর ঝেড়ে নিতে হবে যেন ভিতরে কোনো ইট, লোহা বা কোনো কিছুর টুকরা না থাকে
- গোসলের পর নখ কাটতে হবে, এসময় নখ নরম থাকে এবং সহজে কাটা যায়
- নখ সব সময় সোজা করে কাটতে হবে, গভীর করে নখ কাটা উচিৎ না
- শেভিং ব্লেড দিয়ে নখ না কেটে নেইল কাটার দিয়ে সব সময় নখ কাটা উচিৎ নতুবা নখ বেশী কাটা হয়ে যেতে পারে এবং আঙ্গুলের চামড়া বা মাংসে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে
- পায়ের উপর পা রেখে বসা বা ঘুমানোর অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে, এতে পায়ে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে
- পায়ের কড়া বা নখকুনী থাকলে নিজে নিজে তা কাটা উচিৎ না
- ধাতব কোনো বস্তু দিয়ে নখের নীচ পরিস্কার করা উচিৎ না
- সম্ভব হলে প্রতিদিন পায়ের তলা, পায়ের আঙ্গুল, আঙ্গুলের ফাঁক পরীক্ষা করতে হবে, এজন্য আয়না ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা অন্য কাউকে দেখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে
- পায়ে নিয়মিত ভালো কোনো ময়েশ্চারাইজার মাখা যেতে পারে। কিন্তু পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে মাখা উচিৎ না
- বৃষ্টির পানিতে পা ভেজানো উচিৎ না
- শীত কালে রাতে ঘুমানোর সময় ঢিলা মোজা পরা উচিৎ
- পা ফাটা থাকলে নিজে নিজে কোন চিকিৎসা না করাই ভালো
- দীর্ঘ সময় জুতা মোজা পরার প্রয়োজন হলে ২ ঘণ্টা পর পর কিছু সময়ের জন্য জুতা মোজা খুলে আবার পরতে হবে। সম্ভব হলে কয়েক জোড়া জুতা মোজা কিনে রাখা ভালো। প্রতিদিন একই জুতা না পরা ভালো
- ভেজা পায়ে জুতা মোজা পরা উচিৎ না
- ভেজা পা আলাদা তোয়ালে দিয়ে চাপ দিয়ে মুছতে হবে, কখনই ঘষে ঘষে মোছা উচিৎ না
- ডায়াবেটিক জুতা ও মোজা সঠিক আকার ও সাইজের চামড়ার জুতা কিনতে হবে, যাতে জুতা টাইট বা বেশী ঢিলা না হয়। সম্ভব হলে অর্ডার দিয়ে জুতা বানিয়ে নিতে পারেন। সমান তল ও মোটা সোল বিশিষ্ট জুতা সব চেয়ে ভালো। জুতার সামনের অংশ চওড়া হতে হবে যাতে পায়ের আঙ্গুলগুলোর উপর চাপ না পড়ে। সামনের অংশ চিকন এ ধরণের জুতা পরা উচিৎ না। উঁচু হিলের জুতা বর্জন করতে হবে। সুতীর মোজা পরতে হবে। মোটা মোজা পরিধান করা উচিৎ। মোজা পরার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন মোজা কোথাও ছেঁড়া না থাকে। প্রতিদিন ধোয়া ও শুকনা মোজা পরতে হবে

প্রতিরোধ

প্রথমত ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে। নিয়মিত পায়ের যত্ন নিতে হবে, সব সময় পা পরিস্কার ও শুকনা রাখতে হবে, ডায়াবেটিক মোজা এবং জুতা ব্যবহার করতে হবে। পায়ে যাতে কোনো আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঘরে বাইরে খালি পায়ে হাঁটা যাবে না। ওজন কমাতে হবে, ধুমপান, সাদাপাতা, জর্দা দিয়ে পান খাওয়া বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা পরিত্যাগ করতে হবে, নতুবা এত কষ্ট করে পায়ের যত্ন নিয়েও কোনো লাভ হবে না।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

চমকপ্রদ তথ্য

এবার মানুষের মাথা প্রতিস্থাপন

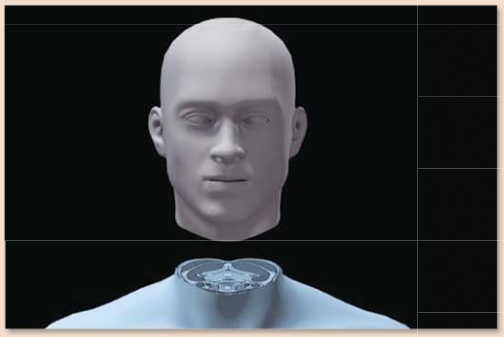

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মাথা প্রতিস্থাপন সম্ভব হবে বলে দাবি করছেন ইতালির স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং তুরিন অ্যাডভান্স নিউরোমডুলেশন গ্রুপের পরিচালক সার্জিও ক্যানাভেরো। তিনি বলেন, মাথা প্রতিস্থাপনের ব্যাপারটি এখন কেবল কল্পবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখার দিন শেষ হয়ে গেছে। এই অস্ত্রোপচার সফল হলে মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করবে। তবে এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থায়নের উদ্যোগ এখনো বাকি রয়েছে। প্রস্তাবিত এই মাথা প্রতিস্থাপনে সাফল্য এলে বিভিন্ন জটিল রোগ এড়িয়ে মানুষের দীর্ঘায়ু অর্জন সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পশুর শরীরে ১৯৭০ সাল থেকে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে। ওই বছর রবার্ট হোয়াইট নামের এক চিকিৎসক একটি বানরের মাথা অপর একটি বানরের শরীরে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন। যুক্তরাজ্যের সান পত্রিকার সঙ্গে আলাপকালে ক্যানাভেরো দাবি করেন, মানুষের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহারে সাফল্য পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন ২০১৭ সালের মধ্যে মানুষের মাথা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

নির্ঘুম শিশুরা বেশি দুষ্টু

যেসব শিশু রোজ সময়মতো ঘুমায় না বা ঘুমের শৃঙ্খলা মেনে চলে না, তাদের আচার আচরণে সমস্যা দেখা দেয়। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের বিজ্ঞানীরা প্রায় ১০ হাজার শিশুর ঘুমের অভ্যাসের ওপর গবেষণা করে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, অনিয়মিত, বিশৃঙ্খল ঘুমের অভ্যাস শিশুদের মস্তিষ্কের আচরণ নিয়ন্ত্রক এলাকায় প্রভাব ফেলে। ফলে তারা খিটখিটে মেজাজ, অতি চঞ্চলতা, অতি দুষ্টুমি ইত্যাদি আচরণ বেশি করতে থাকে। সবচেয়ে জরুরী তথ্য হলো, এই শিশুদের ঘুমের অভ্যাস স্বাস্থ্যকর ও সুশৃঙ্খল করার পর আচরণগত সমস্যাগুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে দেখা গেছে। তবে সতর্ক সংকেত হলো, সারা বিশ্বে অর্ধেকেরও বেশি শিশু কিশোর সময়মতো ঘুমাতে যায় না, সময়মতো ঘুম থেকে জাগেও না। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ে জাগা ছাড়াও রাতের বেলা নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম শিশুদের মস্তিষ্ক গড়ে ওঠার জন্য খুবই দরকারি।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

অন্ধকে দৃষ্টি দেবে কান

অন্ধ ব্যক্তি কানের মাধ্যমে যে শব্দ মস্তিষ্কে গ্রহণ করে, তাকে ছবিতে রূপান্তরের মাধ্যমে এক ধরনের বিকল্প দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংবেদী যন্ত্র (ভিওআইসি) ব্যবহার করা হবে। এটি আশেপাশের বিভিন্ন বস্তুর চিত্র গঠনে মস্তিষ্ককে সহায়তা করবে। ইতিমধ্যে ভিওআইসি ব্যবহার করে সম্ভাব্য সাফল্যের প্রমাণ মিলেছে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব বাথের মাইকেল প্রোউলস বলেন, এই পদ্ধতিতে অন্ধের দৃষ্টি অর্জনে সাফল্যের হার স্টেম সেল প্রতিস্থাপন বা কৃত্রিম রেটিনা সংযোজনের মতো চিকিৎসায় সাফল্যের তুলনায় অধিক হতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ফরমালিন থেকে বাঁচার উপায়

ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইডের পলিমার। ফরমালডিহাইড দেখতে সাদা পাউডারের মতো যা পানিতে সহজেই মিশে যায়। শতকরা ৩০-৪০ ভাগ ফরমালডিহাইড পানিতে মিশিয়ে ফরমালিন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ফরমালিন সাধারনত টেক্সটাইল, প্লাষ্টিক, পেপার, রং, কনস্ট্রাকশন ও মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। ফরমালিনে ফরমালডিহাইড ছাড়াও মিথানল থাকে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। লিভার বা যকৃতে মিথানল এনজাইমের উপস্থিতিতে প্রথমে ফরমালডিহাইড এবং পরে ফরমিক এসিডে রূপান্তরিত হয়। দুটোই শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ফরমালিনের ক্ষতিকর দিক

ফরমালিন সাধারণত দু'ভাবে আমাদের ক্ষতি করতে পারে। ফরমালিন একবার ব্যবহার করলে তাৎক্ষণিক কিছু ক্ষতি করতে পারে এবং বার বার ব্যবহার করলে দীর্ঘমেয়াদী কিছু ক্ষতি করতে পারে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো -

একবার ব্যবহারের ফলে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমূহ

- ফরমালিন ব্যবহার করলে চামড়া, চোখ, মুখ, খাদ্যনালি ও পরিপাকতন্ত্র শ্বাসনালি জ্বালাপোড়া করতে পারে
- চোখ থেকে পানি পড়া, কর্নিয়া অকেজো হওয়া, দৃষ্টিশক্তি পরিবর্তন হওয়া এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারে
- দুর্বলতা ও মাথাব্যথা হতে পারে
- কফ ও কাশি, শ্বাসনালি সংকোচন, শ্বাসনালির অবনয়ন, শ্বাসতন্ত্রে পানি জমা, শ্বাসকষ্ট হতে পারে
- বমি বমি ভাব, বমি করা, রক্তবমি হওয়া, বুক এবং পেটে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া করা, কালো পায়খানা, পেটে গ্যাস হওয়া, পাকস্থলীতে ক্ষত রোগ হওয়া, পেটে পীড়া হতে পারে
- লাল প্রস্রাব হতে পারে, তাৎক্ষণিক কিডনি অকেজোও হয়ে যেতে পারে
- চামড়াতে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন হতে পারে
- ফরমালিনের ব্যবহারে খিঁচুনি হতে পারে, এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে

বার বার গ্রহণের ফলে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সমূহ

- ফরমালিন ব্যবহারের কারণে পেটের পীড়া, হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বদহজম, ডায়রিয়া, আলসার, চর্মরোগ সহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে
- ধীরে ধীরে লিভার, কিডনি, হার্ট, ব্রেন সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়, লিভার ও কিডনি অকেজো হয়ে যায়, হার্টকে দুর্বল করে দেয়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়
- ফরমালিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে পাকস্থলী, ফুসফুস ও শ্বাসনালিতে ক্যান্সার হতে পারে, অস্থিমজ্জা আক্রান্ত হওয়ার ফলে রক্তশূন্যতাসহ অন্যান্য রক্তের রোগ, এমনকি ব্লাড ক্যান্সারও হতে পারে
- ফরমালিন মানবদেহে ফরমালডিহাইড ফরমিক এসিডে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের এসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যাতে শ্বাস প্রশ্বাস অস্বাভাবিক ভাবে ওঠানামা করে
- ফরমালিন গর্ভবতী মেয়েদের ক্ষেত্রেও ঝুঁকির কারণ হতে পারে। সন্তান প্রসবের সময় জটিলতা, বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে, এ ছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হতে পারে
- ফরমালিন চোখের রেটিনাকে আক্রান্ত করে রেটিনার কোষ ধ্বংস করে। ফলে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে

ফল ও সবজি থেকে ফরমালিন দূর করার উপায়

- ফল ও সবজি খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে বা তার চেয়ে একটু বেশী সময় আগে ফল ও সবজি পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। তাহলে ফল ও সবজি থেকে ফরমালিন দূর হবে
- সবজি রান্না করার আগে গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেও ফরমালিন মুক্ত হবে

মাছ থেকে ফরমালিন দূর করার উপায়

ফরমালিনবিহীন মাছের ফুলকা উজ্জ্বল লাল র্বণ, চোখ ও আঁইশ উজ্জ্বল হয়, শরীরে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়, মাছের দেহ নরম হয়। অন্যদিকে ফরমালিনযুক্ত মাছের ফুলকা ধূসর, চোখ ঘোলাটে ও ফরমালিনের গন্ধ পাওয়া যায়, আঁইশ তুলনামূলক ধূসর বর্ণের হয়, শরীরে আঁশটে গন্ধ কম পাওয়া যায়, দেহ তুলনামূলক শক্ত হয়।

- পরীক্ষায় দেখা গেছে পানিতে প্রায় ১ ঘন্টা মাছ ভিজিয়ে রাখলে ফরমালিনের মাত্রা শতকরা ৬১ ভাগ কমে যায়
- প্রথমে চাল ধোয়া পানিতে ও পরে সাধারণ পানিতে ফরমালিনযুক্ত মাছ ধুলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ফরমালিন দূর হয়
- লবনাক্ত পানিতে ফরমালিন দেওয়া মাছ ১ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ফরমালিনের মাত্রা কমে যায়
- সবচাইতে ভাল পদ্ধতি হল ভিনেগার ও পানির মিশ্রনে ১৫ মিনিট মাছ ভিজিয়ে রাখলে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ ফরমালিনই দূর হয়

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মুখের ছত্রাক

মুখের ছত্রাক বা ওরাল থ্রাশ হলো মুখের ছত্রাকজনিত সংক্রমণ। ওরাল থ্রাশ সাদা অথবা ক্রিম রংযুক্ত সংক্রমণ সৃষ্টি করে, যা সাধারণত জিহ্বা অথবা চিবুকের অভ্যন্তরে দেখা যায়। এ ধরনের সংক্রমণ ব্যথাযুক্ত হতে পারে। সংক্রমণস্থল থেকে ব্রাশ করার সময় মৃদু রক্ত বের হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ওরাল থ্রাশ ক্যানডিডা নামক জীবাণুর সংক্রমণের কারণে হতে পারে।

কাদের ওরাল থ্রাশ হয়

নবজাতক, কৃত্রিম দাঁত ব্যবহারকারী, ডায়াবেটিক রোগী, এ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসাধীন রোগী, নেশাগ্রস্ত মানুষ, অপুষ্টিতে ভুগছে এমন মানুষদের ওরাল থ্রাশ হতে পারে ।

কারণ

মুখের ছত্রাক বিভিন্ন কারণে হতে পারে। নিম্নে কিছু কারণ দেয়া হল -

- ক্যানডিডা এলবিকেন্স (Candida albicans)
- দীর্ঘ দিন এ্যান্টিবায়োটিক খেলে
- মুখগহ্বর নিয়মিত পরিস্কার না করলে
- ধূমপান করলে

লক্ষণ

- মুখের অভ্যন্তরে ক্রিম অথবা হলুদাভ দাগ দেখা যায়। এসব দাগযুক্ত স্থান সামান্য একটু উঁচু থাকে। সাধারণত এ স্থানগুলোর নিচে কোনো ব্যথা থাকে না। টুথব্রাশের সময় যদি আঘাত লাগে, তাহলে এখান থেকে সামান্য রক্তপাত হতে পারে
- মুখ থেকে প্রচুর লালা জাতীয় পানি বের হয়
- মাড়িতে সাদা ক্ষত, মুখের কোণে ঘা,গালের ভেতরে মাখনের মতো সাদা প্যাচ, ঠোটের চামড়াতে ছোট ছোট ফুস্কুরি ও সাদা দাগ পড়ে এবং সেই সাথে শুষ্ক ঘা দেখা দিতে পারে
- বয়স্কদের মুখে জ্বালাপোড়া ভাব অনুভূত হতে পারে এবং গলায়ও একই সমস্যা হতে পারে
- শিশুদের আক্রান্ত জায়গায় পুঁজ হতে পারে
- মুখ থেকে খারাপ গন্ধ বের হতে পারে
- তীব্র ব্যথা এবং জ্বর বা টন্সিলাইটিস বা দাঁতের মাড়ির অন্যান্য অসুখ ও হতে পারে
- মাঝে মাঝে রোগী মুখ নাড়াতে পারে না অথবা কিছু খেতেও পারে না
- অনেকের জিহ্বাতে ক্ষত হওয়ার কারণে কিছু খেলে জ্বলতে পারে

চিকিৎসা

মুখের ছত্রাকের জন্য clotrimazole lozenge (এক ধরনের চকলেট) ব্যবহার করা হয় যা ছত্রাক প্রতিরোধে ভালো কাজ করে। এটি চিনি মুক্ত চকলেট, কেননা চিনি মুখের ছত্রাক আরো বাড়িয়ে দেয়। স্বামী স্ত্রীর বেলাই প্রত্যেকদিন Nystatin জাতীয় মাউথ ওয়াস ব্যবহার করতে হবে। মুখের ছত্রাক যদি শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়ে বা ব্যাপক আকার ধারণ করে তাহলে, Amphotericin B (মুখে খাওয়া যায়, শিরা পথেও ব্যবহার করা যায়) ব্যাবহার করতে হবে। শিশুদের জন্য এন্টিফাঙ্গাল জাতীয় ড্রপ বেশ উপকারী। শিশুদের বেলায় ১% Gentian Violet ও ভালো কাজ করে। মায়ের স্তনে এন্টিফাঙ্গাল ক্রিম ব্যবহার করা ভাল এবং অবশ্যই মায়ের বা শিশুর জামা কাপড় যাতে ছত্রাক মুক্ত থাকে সে দিকে বাড়তি খেয়াল রাখাতে হবে। বড়দের বেলায় এন্টি ফাঙ্গাল ট্যাবলেট এক নাগাড়ে দুই সপ্তাহ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আক্রান্ত ব্যক্তির নরম টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা উচিত। যদি ডায়াবেটিস

থাকে তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ছত্রাককে উজ্জীবিত করে এমন সব খাবার কম করে খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সরাসরি চিনি জাতীয় খাবার না খাওয়াই ভালো। চিনি ছাড়া দই খাওয়া উত্তম। প্রতিরোধক হিসাবে আপেল সিডার ভিনিগার এক চামচ, আধা গ্লাস পানিতে দিয়ে খাওয়া যেতে পারে। মুখের ছত্রাকের বেলায় কোনো ধরনের এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা মানেই অসুখকে তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে দেয়া, সেজন্য এই দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

সতর্কতা

ওরাল থ্রাশের চিকিৎসায় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ ওরাল থ্রাশের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু ওষুধ অনেক সময় রোগীর দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যাদের কিডনি রোগ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। মুখের ফাংগাল সংক্রমণে চিকিৎসা প্রদান করার আগে রোগীর কোনো যৌনরোগ আছে কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে। অহেতুক ওষুধ প্রয়োগ না করাই উত্তম।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

শীতে পা ফাটা

পা ফাটা বা গোড়ালির ফাটল কেবল একটি সাধারণ সৌন্দর্য সংক্রান্ত সমস্যাই নয়, এটি একটি বিরক্তিকর সমস্যাও। কিন্তু এ থেকে আবার গুরুতর শারীরিক সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। পায়ের তলায় গোড়ালির বাইরের দিকের চামড়া শক্ত, শুষ্ক হয়ে গেলেও ছাল উঠতে থাকলে পা ফাটে, এবং মাঝে মাঝে এত গভীর ফাটল হয় যে ব্যথা করে বা রক্ত বের হয়। শীতকালে অনেকেরই পা ফাটে, কিন্তু কারো কারো এই সমস্যা খুব বেশি প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে যেমনঃ যাদের থাইরয়েডে সমস্যা আছে, ডায়াবেটিসের রোগী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাদের সোরিয়াসিস, একজিমা বা কোনো চর্মরোগ আছে।

কারণ

- খালি পায়ে হাটার ফলে পায়ে এক ধরনের ফাঙ্গাস তৈরি হয়। এই ফাঙ্গাসটাই ধীরে ধীরে বেড়ে পায়ের গোড়ালিতে ছড়ায়। আর এর ফলেই পা ফেটে যায়
- আমরা বাড়িতে সাধারণত ঘর পরিষ্কার করার জন্য যেসব ডিটার্জেন্ট বা সাবান ব্যবহার করি তা পায়ে লাগার ফলেও পা ফেটে যায়
- বেশি সময় পানিতে থাকার ফলেও পা ফেটে যেতে পারে
- প্লাস্টিকের জুতা, চপ্পল পরার ফলেও পা ফেটে যেতে পারে
- অত্যধিক ওজন থাকার ফলে পায়ের ওপর অত্যধিক ওজন পড়ে, সে কারণেও পা ফাটতে পারে
- শরীরে ভিটামিন, আয়রন ও ক্যালসিয়ামের অভাব হলেও পা ফেটে যেতে পারে

পরামর্শ

- খুব ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পা মোজা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে
- ঘরের ভেতরে মেঝেতে স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে
- শীতকালে গোড়ালি ঢাকা ও আরামদায়ক জুতা পরতে হবে
- শীতকালে শাকসবজি বেশি বেশি খেতে হবে
- শীতকালে পরিমিত পানি পান করতে হবে
- প্রতিদিন গোসল বা অজুর সময় পা ভেজানোর পর শুকনো তোয়ালে বা কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে ফেলতে হবে
- গোড়ালি ও পায়ের তালুতে পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন মাখা ভালো
- সপ্তাহে অন্তত এক দিন গামলায় লেবুর রসমিশ্রিত হালকা গরম পানিতে পা ভিজিয়ে পা ঘষে মৃত কোষ ফেলে দিতে হবে। লেবুর রসে যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড আছে তা মৃত কোষ ঝরাতে সাহায্য করে। তারপর পা মুছে পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন লাগাতে হবে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশঃ জরায়ুতে টিউমার হলে কি সন্তান ধারণে কোনো সমস্যা হতে পারে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, জরায়ু টিউমারের জন্য সন্তান ধারণে সমস্যা বা বারবার গর্ভপাত বা বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। ৩০-৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে জরায়ু টিউমারের জন্য বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। টিউমারের কারণে জরায়ু অতিরিক্ত বড় হয়ে গেলে, ভ্রূণ ঠিকমতো বেড়ে উঠতে পারে না। জরায়ু ও ফেলোপিয়ান টিউবের সংযোগস্থলে বা এমন জায়গায় টিউমারটির অবস্থান হয়, যা ভ্রূণকে সুস্থিত হতে বাধা দেয়। এসব ক্ষেত্রে বারবার গর্ভপাত ঘটে বা বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সন্তান নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ রাতের খাবার খেয়েই বা অল্প সময় পরই ঘুমানো কি স্বাস্থ্যকর?

উত্তরঃ খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমানো সেটা দুপুর কিংবা রাত হোক, কখনোই স্বাস্থ্যকর নয়। খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে না শুয়ে ১৫-২০ মিনিট বসে থাকা বা হাঁটাহাঁটি করা উচিৎ। রাতে ঘুমানোর প্রায় দুই ঘণ্টা আগে খাবার খাওয়া উচিৎ। আরো ভালো হয় মাঝরাত বা দেরি করে খাবার না খেয়ে আগেই খাবার খাওয়া। এতে রাতের খাবার হজম ভালো হয় ও হজমশক্তিও ভালো থাকে।

প্রশঃ মাড়সহ ভাতে কি পুষ্টি বেশি থাকে?

উত্তরঃ মাড় ফেলে দেওয়া ভাতের তুলনায় মাড়সহ বা বসা ভাতে ক্যালরির পরিমাণ অবশ্যই বেশি থাকে। এতে শর্করা, থায়ামিন ইত্যাদি বেশি পরিমাণে থাকে। সে কারণে গ্রামাঞ্চলে অপুষ্টি ঠেকাতে আগে বসা ভাত খাওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু স্থূলতা বা ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তির এ ধরনের ভাত না খাওয়াই ভালো।

প্রশ্নঃ স্তন্যপানরত শিশুদেরও কি ঠান্ডা কাশিতে মধু, লেবু বা তুলসী পাতার রস খাওয়ানো যাবে?

উত্তরঃ শিশুদের কাশি প্রশমনের জন্য দু-এক ফোঁটা মধু বা লেবুর রস বা তুলসী পাতার রস বুকের দুধের সঙ্গে খাওয়ানো যেতে পারে। এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং শিশু খানিকটা আরাম পেতে পারে। তবে বাসক পাতার রসে তেমন উপকার হয় না এবং এর তিতকুটে স্বাদে শিশু বিরক্ত হতে পারে। এ ছাড়া বুকের দুধ দেওয়ার ১৫ মিনিট আগে শিশুর বন্ধ নাক লবণমিশ্রিত পানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে, যাতে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শ্বাস বন্ধ না হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ নবজাতক শিশুর দিন রাতের ঘুমচক্র ঠিক হতে কত দিন সময় লাগে?

উত্তরঃ জন্মের পর শিশুরা সাধারণত দুই থেকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত দিনে গড়ে ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা ঘুমায়। পাঁচ ছয় মাস বয়স হওয়ার পর ঘুমের ছন্দে একটি পরিণত ভাব আসে। শিশুরা রাত জাগলে তাই ধৈর্য না হারিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। এমনিতে টানা চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকা পর্যন্ত শিশুকে জাগানো উচিৎ নয়। এর বেশি ঘুমালে হালকা সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে বুকের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। পেট ভরে গেলে সে আবারও নিবিড় ঘুমে তলিয়ে যাবে।

প্রশঃ শিশুদের প্যারাসিটামল মুখে খাবার সিরাপ ও পায়ুপথে ব্যবহারের সাপোজিটরির মধ্যে কার্যকারিতার পার্থক্য আছে কি?

উত্তরঃ নেই। দুটোই একই উপাদান, অর্থাৎ এসিটামিনোফেন দিয়ে তৈরি। কেবল দেহে প্রবেশের পথটি আলাদা। অনেকের ধারণা, সাপোজিটরি সিরাপের চেয়ে বেশি কার্যকর। জ্বর বেশি হলে সিরাপ না দিয়ে সাপোজিটরি দেওয়া উচিৎ। কিন্তু আসলে কার্যকারিতা বা নিরাপত্তার দিক দিয়ে সিরাপ বা সাপোজিটরি একই ধরনের। তবে কোনো শিশু যদি বারবার বমি করে ওষুধ ফেলে দেয় বা গিলতে না পারে, সে ক্ষেত্রে মুখে খাবার সিরাপের বদলে সাপোজিটরি ব্যবহারই শ্রেয়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

কালাজ্বর

কালাজ্বর একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাণনাশক জীবাণু ঘটিত রোগ। কালাজ্বর একটি রোগ যা লিশম্যানিয়া ডোনোভানি (Leishmania donovani) নামক পরজীবীর মাধ্যমে হয়। এই রোগ লিশম্যানিয়াসিস রোগের কয়েকটি প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর। বেলেমাছির কামড়ের দ্বারা এটি বিস্তার লাভ করে। পরজীবী ঘটিত রোগগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয় প্রাণঘাতী রোগ; ম্যালেরিয়ার পরেই এর স্থান। লিশম্যানিয়াসিসে প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। পরজীবীটি মানুষের কলিজা, প্লীহা ও অস্থিমজ্জাতে সংক্রমন ঘটায় এবং চিকিৎসা না দিলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কালাজ্বর এইচআইভি সংক্রমণের সহযোগীরূপে আবির্ভূত হয়ে নতুন সংকটের জন্ম দিচ্ছে।

বাংলাদেশে কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব

বাংলাদেশে প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কালাজ্বরের সন্ধান পাওয়া গেলেও সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

কারণ

স্ত্রী ফ্লেবোটোমাস স্যান্ড ফ্লাই (Phlebotomus Sand Fly) মাছির কামড়ে এই জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। এই জীবাণু দেহে দুই থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। জীবাণু প্রবেশের পর তা প্রাথমিক পর্যায়ে রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে এবং সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। ফলে লোহিত কণিকা ভেঙে যায় এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। রোগ সৃষ্টি করতে জীবাণুবাহিত মাছির একবার কামড়ই যথেষ্ট। এরা মাটির ঘরে, বিশেষ করে যাদের বাড়িতে গরু আছে সেখানে বেশি থাকে। তবে নোংরা পরিবেশে বসবাস করলে এ রোগের ঝুঁকি তৈরি হয়।

কিভাবে ছড়ায়

- স্ত্রী ফ্লেবোটোমাস স্যান্ড ফ্লাই (Phlebotomus Sand Fly) মাছির কামড়ানোর মাধ্যমে মানুষের শরীরে কালাজ্বরের জীবাণু ছড়ায়
- কালাজ্বরের জীবাণুবাহী মাছিগুলো সন্ধ্যায় এবং রাতেই বেশি কামড়ায়। যদিও দিনে প্রখর সূর্যের আলোতে খুব একটা কামড়ায় না তবে অনেক সময় ঝোপ ঝাড় পরিষ্কারের সময় দিনের বেলাতেও এরা কামড়াতে পারে
- কামড়ানোর দুই থেকে ছয় মাসের মধ্যে রোগের সংক্রমণ ঘটে

লক্ষণ ও উপসর্গ

- দীর্ঘদিন ধরে জ্বর (তবে এই জ্বর প্রতিদিন নিয়মিত আসে না, মাঝে মধ্যে হঠাৎ এই জ্বর আসে আবার চলে যায়)
- বার বার জ্বর আসা
- রক্তশূন্যতা
- ক্ষুধামন্দা
- দেহের ওজন কমা
- দুর্বলতা
- অবসন্ন বোধ করা
- লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া (Lymphadenopathy)
- যকৃত এবং প্লীহা ফুলে যাওয়া
- চামড়ার রং কালো হওয়া, বিশেষ করে কপাল, পেট, হাত ও পা
- কখনো কখনো অতিরিক্ত রক্তপাত (পায়খানার রাস্তায় বা মাসিকের সময়) হওয়া

রোগ নির্ণয়

ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে কালাজ্বর নির্ণয় করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশের যেকোনো সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যে আর-কে ৩৯ নামের এক ধরনের স্ট্রিপের মাধ্যমেও সহজে এই রোগ শনাক্ত করা যায়।

ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা

দুই সপ্তাহের বেশি জ্বর হলে এবং লক্ষণ দেখে ম্যালেরিয়া নাশক (Anti-malarial) ও এন্টিবায়েটিক সেবনেও কোনো কাজ না হলে কালাজ্বর হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা

- রক্ত পরীক্ষা
- অস্থিমজ্জা, প্লীহা এবং লসিকানালী থেকে নমুনা নিয়ে তার মধ্যে কালাজ্বরের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ

চিকিৎসা

মিলটেফোসিন, সোডিয়াম স্টিবগ্লুকোনেট, অ্যামফোটেরিসিন বি ডিঅক্সিকোলেট - এই তিনটি ওষুধ বেশি ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ঃ

- গর্ভবতী মহিলা
- যে মায়েরা বাচ্চাকে দুধ পান করায়
- দুই বছরের নিচের শিশু
- অধিক রক্তশূন্যতাসহ কালাজ্বরের রোগী
- যক্ষ্মাসহ কালাজ্বরের রোগী
- এইডসসহ কালাজ্বরের রোগী
- অন্যান্য জটিল রোগসহ কালাজ্বরের রোগী

কালাজ্বর প্রতিরোধ

- সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত যতটা সম্ভব বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা এই সময়ই মাছিগুলো বেশি সক্রিয় থাকে
- ঘরের বাইরে থাকলে শরীর যতটা সম্ভব ঢেকে রাখতে হবে, আবহাওয়া অনুযায়ী যতটা সহনীয় বড় হাতার শার্ট, বড় প্যান্ট এবং মোজা পরতে হবে এবং প্যান্টের ভিতর শার্ট গুঁজে রাখতে হবে
- স্যান্ডফ্লাই বা বালু মাছিগুলো মশার থেকেও ছোট। তাই ছোট কোনো ফাঁক দিয়েও মাছি ঢুকে যেতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে ঘরের দেয়ালে কোনো ফুটো থাকলে তা বন্ধ করে দিতে হবে
- ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে এবং ভালো করে গুঁজে দিতে হবে, সম্ভব হলে মশারী, পর্দা, বিছানার চাদর এবং কাপড় চোপড়ে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে
- রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের বাহক স্যান্ডফ্লাই বা বালু মাছি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে কীটনাশক ঔষধ যেমনঃ ডিডিটি ছিটিয়ে বালু মাছি মারার ব্যবস্থা করতে হবে
- বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ফেলতে হবে যেহেতু গোয়াল ঘরেই বালু মাছি বেশি পাওয়া যায় তাই গোয়াল ঘর পরিষ্কার করে আবর্জনা নিয়মিত নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে
- ইঁদুরের গর্ত, বালু মাছির জন্ম ও বিশ্রামের অন্যতম স্থান, তাই ইঁদুরের গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে
- উপদ্রুত এলাকায় রোগী খুজে বের করে তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চিকিৎসা পরবর্তী অবস্থার খোজ রাখতে হবে

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

জরায়ুর টিউমার

নারীদের প্রজননক্ষম বয়সে জরায়ুতে সবচেয়ে বেশি যে টিউমারটি হয়ে থাকে তা হল জরায়ুর টিউমার বা ফাইব্রয়েড, যা মায়োমা নামেও পরিচিত। আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে জরায়ুর টিউমার বা ফাইব্রয়েড একটি অতি পরিচিত টিউমার। চিকিৎসা শাস্ত্রে একে ইউটেরাইন ফাইব্রয়েডও (Uterine fibroid) বলা হয়। জরায়ুর মাংসপেশীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে এই টিউমার হয়। মূলত এই রোগটি জিনগত বা বংশগত কিন্তু যে কোনো নারীর জরায়ুতে এই টিউমার হতে পারে।

এক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন হরমোন কে দায়ী করা হয়। দেখা গেছে ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ২০% মহিলার ফাইব্রয়েড হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো কোনো সমস্যা করে না। তবে গর্ভকালীন সময়ে একটু বেশি সর্তক থাকা প্রয়োজন। সাধারণত ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে এ টিউমার বেশি দেখা যায়।

কারণ

ফাইব্রয়েড বা জরায়ুর টিউমার কেন সৃষ্টি হয় তার প্রকৃত কারণ এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি। তবে ধারণা করা হয়, নারীদের দেহে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণের সঙ্গে এই ফাইব্রয়েড সৃষ্টির কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, নারীর দেহে যখন

ইস্ট্রোজেন সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষরণ হয় সেই সময় অর্থাৎ ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সে ফাইব্রয়েড তৈরি হয়। আবার মেনোপজ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফাইব্রয়েডের বৃদ্ধি থেমে যায়। মূলত নারীদের জরায়ুতে ফাইব্রয়েড হয়ে থাকে। তবে জরায়ুর পেশিতে ও অন্তঃত্বকে, ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখে, ব্রড লিগামেন্ট ও ডিম্বাশয়ের পাশেও ফাইব্রয়েড সৃষ্টি হতে পারে। ফাইব্রয়েড এক ধরনের টিউমার হলেও এ থেকে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা এক শতাংশেরও কম।

উপসর্গ

- সাধারণত ৭৫% ক্ষেত্রেই কোনো উপসর্গ থাকে না ৩০% মহিলাদের মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়ে থাকে, প্রতিবার মাসিকেই রক্তস্রাবের পরিমাণ বাড়তে থাকে
- অস্বাভবিক রক্তস্বল্পতা
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই মাসিকের মাঝামাঝি সময় রক্ত যেতে পারে
- মাসিকের সময় তলপেটে অতিরিক্ত ব্যাথা হওয়া
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূত্রত্যাগে ও মলত্যাগে সমস্যা হতে পারে
- কিছু ক্ষেত্রে তলপেটের আকার এতটাই বড় হয় যে রোগীকে গর্ভবতীর মতো মনে হতে পারে
- ৩০% ক্ষেত্রে বাচ্চা না হওয়ার মতো সমস্যাও হতে পারে
- জরায়ুতে টিউমার থাকা অবস্থায় যারা গর্ভধারণ করে তাদের গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এছাড়াও সময়ের অনেক আগে প্রসব বেদনা হতে পারে ও বাচ্চার ওজন কমে যেতে পারে

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

পেলভিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে একে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়। নিশ্চিতভাবে বোঝার জন্য আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয়, যার মাধ্যমেই সাধারণত এই টিউমার নির্ণয় করা যায়। জরায়ুর ভেতরে টিউমার হিস্টারোস্কোপি এবং জরায়ুর বাইরের টিউমার ল্যাপারোস্কোপির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

এই রোগের প্রধান চিকিৎসাকে বলা হয় ল্যাপ্যারোস্কোপিক অ্যান্ড হিস্টেরোস্কোপিক মায়োমেক্টমি। ফাইব্রয়েডের সমস্যা দূর করতে এটি এখন সবচেয়ে বেশী করা হয়। এতে সনাতন পদ্ধতিতে পেট কাটতে হয় না। মাইক্রোসার্জারি করা হয় বলে ভবিষ্যতে গর্ভধারণেও কোনও সমস্যা হয় না।

এছাড়াও নিম্নলিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট

এই পদ্ধতিতে কোনোরকম চিকিৎসা না করে ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং মেনোপজ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়।

মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট

এই চিকিৎসায় ওষুধ ও ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে হরমোন থেরাপি দিয়ে ফাইব্রয়েড শুকিয়ে ফেলা হয়। বিশেষ করে যারা মা হতে চান তাদের জন্য এই চিকিৎসা অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

এম্বোলাইজেশনঃ এই চিকিৎসার মাধ্যমে ফাইব্রয়েডে রক্ত সরবরাহকারী সমস্ত ধমনীগুলো বন্ধ করে দিলে তা আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। তবে এই পদ্ধতিটি কিছুটা যন্ত্রণাদায়ক আর গর্ভধারণে কিছুটা সমস্যা হয়। যেহেতু কাটা ছেঁড়া করার প্রশ্ন নেই, তাই এই পদ্ধতিটি অনেক বেশি নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন।

সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট

ল্যাপারোস্কোপিঃ এই অপারেশনে রোগীর পেটে শুধুমাত্র দুটি বা তিনটি ছোট ছিদ্র করে অপারেশনটি করা হয়।

হিস্টেরোস্কোপিঃ জরায়ুতে হিস্টেরোস্কোপ যন্ত্রের ক্যামেরা ঢুকিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ল্যাপারোটমিঃ এটি এক ধরনের ওপেন সার্জারি। সরাসরি পেট কেটে ফাইব্রয়েড বাদ দেওয়া হয়।

হিস্টেরেকটোমিঃ এই পদ্ধতিতে টিউমার অর্থাৎ ফাইব্রয়েডসহ গোটা জরায়ুটি অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয়। মূলত যারা মা হয়ে গিয়েছেন অর্থাৎ আর সন্তান নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপসর্গ না থাকলেও এই টিউমার অপারেশন করা লাগতে পারে। যেমন-

- টিউমারের আকার যদি ১২-১৪ সপ্তাহ গর্ভাবস্থা আকারের সমান হয়
- টিউমারের আকার দ্রুত বাড়তে থাকলে
- যদি টিউমারের জন্য বাচ্চা না হয়
- যদি কোনো মহিলার বাচ্চা নেওয়ার দরকার হয় তবে অপারেশন করে টিউমারটি ফেলে দেওয়া যেতে পারে, আর যদি বাচ্চা নেওয়ার প্রয়োজন না হয় এবং মহিলার বয়স ৪০ এর বেশি হয় এবং অন্য উপসর্গগুলো প্রকট হয় তাহলে জরায়ু ফেলে দেয়াই উত্তম

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ "ডায়াবেটিক ফুট" থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই কার্ডটি আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১) কত বছর যাবৎ ডায়াবেটিস থাকলে জটিলতা দেখা দিতে পারে?

ক) ৫ বছর
খ) ৭ বছর
গ) ১০ বছর
ঘ) ১২ বছর

২) নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতর রক্তনালীর জটিলতা?

ক) হৃদরোগ
খ) ডায়াবেটিস জনিত কিডনির রোগ
গ) উচ্চ রক্তচাপ
ঘ) পিত্তথলিতে পাথর

৩) নিচের কোনটি বৃহত্তর রক্তনালীর জটিলতা?

ক) উচ্চ রক্তচাপ
খ) ডায়াবেটিস জনিত চোখের রোগ
গ) পায়ের রক্তনালীর রোগ
ঘ) হাঁপানি

৪) কত শতাংশ ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক ফুট হতে পারে?

ক) ১০%
খ) ১৫%
গ) ২০%
ঘ) ২৫%

৫) নিচের কোনটি ডায়াবেটিক ফুট প্রতিরোধের উপায় নয়?

ক) ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে রাখা
খ) পা পরিস্কার ও শুকনা রাখা
গ) ঘরে বাইরে কোথাও খালি পায়ে না হাঁটা
ঘ) নিয়মিত খেলাধূলা করা

৬) ডায়াবেটিস রোগীর পায়ে ক্ষত তৈরির প্রধান কারণ কোনটি?

ক) ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথী
খ) মেনিনজাইটিস
গ) লিভার সিরোসিস
ঘ) কিডনিতে পাথর

৭) ওয়াগনারের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ডায়াবেটিক রোগীর পায়ের ক্ষতকে কয়টি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে?

ক) ৫টি গ্রেডে
খ) ৮টি গ্রেডে
গ) ৬টি গ্রেডে
ঘ) ৪টি গ্রেডে

৮) ডায়াবেটিস রোগীর জন্য কোন ধরণের জুতা সব থেকে ভালো?

ক) মোটা তল ও সমান সোল বিশিষ্ট জুতা
খ) সমান তল ও মোটা সোল বিশিষ্ট জুতা
গ) উঁচু হিলের জুতা
ঘ) সামনের অংশ চিকন

৯) সকালের নাস্তার আগে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কতো রাখা উচিৎ?

ক) ৬.১ মিলিমোল/লিটার বেশি
খ) ৮ মিলিমোল/লিটার নিচে
গ) ৬.১ মিলিমোল/লিটার নিচে
ঘ) ৮ মিলিমোল/লিটার বেশি

১০) HbA1c এর মাত্রা কতো রাখা উচিৎ?

ক) ৭% এর নীচে
খ) ১০% এর উপরে
গ) ৪% এর নীচে
ঘ) ৭% এর উপরে

আগুনে পুড়ে গেলে ৬টি প্রাথমিক চিকিৎসা

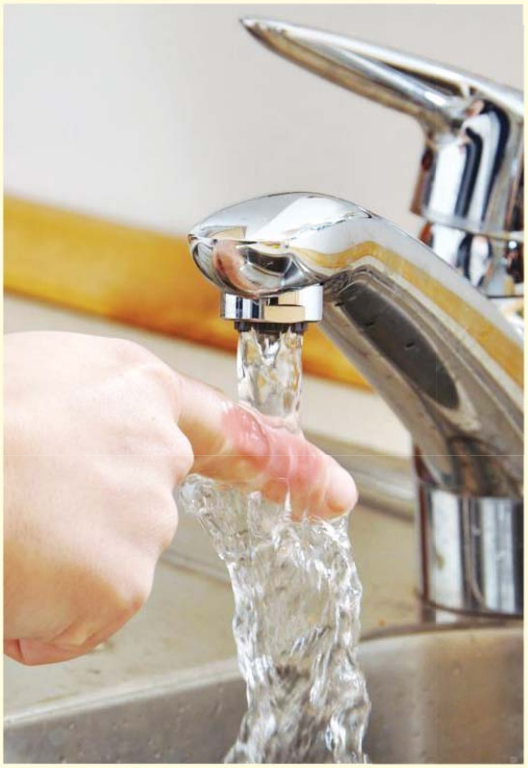

ঠান্ডা পানি

পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোড়া স্থানটি কয়েক মিনিট ধরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। পুড়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঠান্ডা পানি ব্যবহার করলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। ঠান্ডা পানি পোড়া জায়গার জ্বালা পোড়া কমিয়ে দেয় এবং ফোসকা পড়ার ঝুঁকি কমায়। প্রতি দুই তিন ঘন্টা পর পর আক্রান্ত স্থানটি ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। ঠান্ডা পানির বদলে ঠান্ডা দুধও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে পোড়া স্থানে বরফ ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারণ বরফ পোড়া স্থানের রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়ে পোড়া স্থানের ক্ষত আরো বাড়িয়ে দিতে পারে।

ডিমের সাদা অংশ

শরীরের যে স্থানে পুড়ে গেছে সেখানে ডিমের সাদা অংশ দিলে উপকার আসতে পারে। পোড়া জায়গার পরিমাণ বুঝে একটি বা দুটি ডিমের সাদা অংশ লাগানো যেতে পারে। পোড়া স্থানে যতক্ষন ডিমের সাদা অংশটা ভেজা ভেজা থাকবে ততক্ষণ জ্বালা পোড়া ভাব থাকে না। শুকিয়ে গেলে আবার জ্বালা পোড়া শুরু হলে আরেকটি ডিমের সাদা অংশ লাগানো যেতে পারে। ডিমের সাদা অংশ পোড়া ক্ষত দ্রুত সারিয়ে দেয় এবং ত্বকে পোড়া দাগ পড়তে দেয় না।

অ্যালোভেরা (ঘৃতকুমারী)

কোথাও পুড়ে গেলে অ্যালোভেরার (ঘৃতকুমারী) তাজা রস বের করে পোড়া জায়গায় লাগানো যেতে পারে। অ্যালোভেরাতে ব্যাথা কমানোর গুণ আছে। পোড়া জায়গায় অ্যালোভেরা লাগিয়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্বকে শীতল অনুভূতি পাওয়া যায় এবং জ্বালা ভাব কমে যায়। প্রথমে পোড়া জায়গাটা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে এক টুকরো অ্যালোভেরার পাতা থেকে তাজা রস বের করে পোড়া স্থানে লাগালে উপকার পাওয়া যাবে। এভাবে দিনে বেশ কয়েকবার লাগাতে হবে।

মধু

আগুনে পুড়ে যাওয়া স্থানে মধু দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বালা পোড়া ভাব কমে যায়। মধু হলো প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক তাই পোড়া স্থানে মধু লাগালে জীবাণু মেরে ফেলে ইনফেকশনের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় ও দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে। একটি পরিষ্কার পাতলা সুতি কাপড় বা গজে মধু লাগিয়ে পোড়া জায়গায় দিতে হবে। এবার পোড়া জায়গায় মধু লাগানো কাপড়টি বেঁধে রাখতে হবে। দিনে ৩ থেকে ৪ বার কাপড়টা বদলানো ভালো। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পোড়ার ক্ষত দ্রুত ভালো হবে এবং দাগ হবে না।

টি ব্যাগ

চা পাতায় আছে ট্যানিক এসিড যা ত্বককে শীতল করে। তাই পোড়া স্থানে ভেজা, ঠাণ্ডা টি ব্যাগ ব্যবহার করলে ত্বকের জ্বালা ভাব ও অস্বস্তি অনেকটাই কমে যায়। পোড়া জায়গায় কয়েকটি ঠান্ডা ভেজা টি ব্যাগ ধরে রাখতে হবে। টি ব্যাগ গুলোকে পোড়া জায়গায় ধরে রাখার জন্য পাতলা সুতি কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। পোড়া জায়গায় চা পাতাও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে তিনটি টি ব্যাগের সমপরিমাণ চা পাতা দিয়ে চায়ের লিকার বানিয়ে ঠান্ডা করে নিয়ে আক্রান্ত স্থানে পরিষ্কার তুলো বা নরম কাপড় দিয়ে লিকারটি লাগাতে হবে।

ভিনেগার

ভিনেগার হলো প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক। তাই পুড়ে যাওয়া জায়গায় ভিনেগার ব্যবহার করলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। ভিনেগারের সাথে সমপরিমাণে পানি মিশিয়ে নেওয়া ভালো। এবার এই ভিনেগার মেশানো পানি দিয়ে পোড়া জায়গা কিংবা ক্ষত স্থানটি ধুয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণটি ব্যথা কমিয়ে ত্বকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। ক্ষত স্থানে ভিনেগার লাগিয়ে উপরে একটি কাপড় বেঁধে রাখতে হবে। প্রতি দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর কাপড়টা বদলে ফেলা ভালো।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ADVANCING
POSSIBILITIES